International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-IV, January 2016, Page No. 01-5
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

প্রতীয়মান ও বাচ্য অর্থ: আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক গ্রন্থ অনুসরণে একটি তুলনামূলক আলোচনা

ড. কল্যাণ ব্যানার্জী
সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ভারত

Abstract

In *Anandavardhans* ***Dhavanyaloka*** there is a clear distinction between *bachyartha* and *protiomanartha(**Dhvani**)*. The strategy taken by *Anandavardhana* for differentiating *bachyartha* and *protiomanartha* was unique.he has tried enough to show that *protiomanartha* has an important role in ***kavya*** (literature), but he never neglected *bachyartha* which is known as pramary meaning in ***kavya***. *Anandavardhana* described the relation between *bachyartha* and *protiomanartha*. He claims that *protiomanartha* is the soul of ***kavya***, it exceeds all limits of decorum. According to him *protiomanartha* enhances the asthetic pleasure of ***kavya***. In this article I have discussed elaborately the relation between *bachyartha* and *protiomanartha* as discussed *in Anandavardhans* ***Dhavanyaloka*** and have tried to furnish a comperativ study between *bachyartha* and *protiomanartha.*

কাব্যের শরীর ও আত্মা দুইই ব্যবস্থিত। কাব্যের শরীর হল শব্দ ও অর্থ হল আত্মা। দেহের কৃশত্ব স্থুলত্ব যেমন সর্বজনসঘবেদ্য ঠিক তেমনি শব্দের ধর্মও সর্বজন সংবেদ্য, অপরদিকে আত্মার ধর্ম যেমন সর্বজনসংবেদ্য নয়, অর্থও তেমনি সর্বজনসংবেদ্য নয়। আত্মা কেবল আত্মাভজনতৎপর ব্যক্তিগণেরই উপলব্ধির বিষয়, ঠিক তেমনি কেবল সহৃদয়সংবেদ্য, সহৃদয়সত্তাবিশিষ্টব্যক্তিগণই অর্থের উপলব্ধি করেন। সাধারণত শব্দ থাকলেই অর্থ থাকে, তবে শব্দের যে কোন অর্থ দিয়েই কাব্য হয় না, নানা লৌকিক বাক্য ও বৈদিক বাক্যের অর্থ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা কাব্য নয়। শব্দের অর্থের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যাতে তা কাব্য হতে পারে। আনন্দবর্ধনের মতে অর্থের সেই বৈশিষ্টটি শব্দের বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে পাঠকের মনে লোকত্তর ভাবনার উদ্রেক করে। এজাতীয় অর্থকেই আনন্দবর্ধন সহৃদয়শ্লাঘ্য বলেছেন, আর এই অর্থই হল প্রতীয়মান অর্থ যা কাব্যের আত্মা। বাচ্য ও প্রতীয়মান নামে যে দুটি ভেদের কথা আনন্দবর্ধন বলেছেন তা অর্থের দুটির ভেদ কাব্যাত্মার দুটি ভেদ নয়। তাঁর মতে এক শরীরে দুটি আত্মা থাকতে পারে না। প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা, আর এই আত্মাই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কাব্যাআত্মারূপে যে অর্থের কথা আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেন তাঁর দুটি ভেদ হল এক বাচ্য এবং দুই প্রতীয়মান। তাঁর মতে কাব্যাত্মরূপে যে প্রতীয়মান অর্থ তাই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা, কিন্তু বাচ্য অর্থ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়।

রমনীগণের লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করে আনন্দবর্ধন ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, রমণীগণের লাবণ্য রমণীর সর্ব অবয়ব অতিরিক্ত ও তার সর্ব অলংকারের অতিরিক্ত একটি সম্পদ যা কেবল সহৃদয়বত্তাদের কাছেই ধরা দেয়, ঠিক তেমনি ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ বাচ্য অর্থ বা মুখ্য অর্থ অতিক্রম করে সম্পূর্ণ পৃথক ও অতিরিক্ত কিছু যা হৃদয়বান পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। রমণী দেহের লাবণ্য যেমন তার সুন্দর কায় ও বিবিধ অলংকারের অতিরিক্ত, কিন্তু এগুলির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়, ঠিক তেমনি প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি বাচ্যার্থ থেকে অতিরিক্ত কিন্তু বাচ্যার্থের উপর আরূঢ় হয়ে উপলব্ধ হয়। আনন্দবর্ধনের মতে প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থের শক্তির দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় (বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং) এবং আক্ষিপ্ত হওয়ার পর প্রতীয়মান অর্থ বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনির সৃষ্টি করে। বস্তু, অলংকার, ও রস এই তিন প্রকার ধ্বনি অভিধা শক্তির

দ্বারা আক্ষিপ্ত হলেও সেগুলি বাচ্যার্থ থেকে পৃথক ও তার অতিরিক্ত। বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি কাব্যের অঙ্গ, তবে রসধ্বনিই মুখ্য। বস্তু ও অলংকার ধ্বনি রস ধ্বনিতেই পর্যাবসিত হয়।[১] এজন্যই রসধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে।

আনন্দবর্ধন প্রতীয়মান অর্থের গুরুত্ব ও অর্থ অনুধাবনের উপায় নির্দেশ করার পর বাচ্য অর্থ ও প্রতীয়মান অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে মহাকবিগণ বাচ্য-বাচককে মিলিয়ে কাব্য করেন না, বরং ব্যঞ্জক শব্দ, ব্যঞ্জনা ব্যাপার ও ব্যঙ্গ অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থের যথোচিত সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্য করেন। মহাকবিগণ কাব্যে ব্যঙ্গ বা প্রতীয়মান অর্থের উপর প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষপাতি, কিন্তু তবুও তাঁরা বাচ্য অর্থকে অবহেলা করেন না। প্রশ্ন হল মহাকবিগণ কাব্যে ব্যঙ্গ অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েও বাচ্য অর্থের প্রতি যত্নবান হন কেন? এর উত্তরে আনন্দবর্ধন বলেছেন বাচ্য অর্থ হল ব্যঙ্গ অর্থ লাভের উপায়। উপায় ছাড়া উপেয় অন্ধ। উপায়ের দ্বারাই উপেয় আলোকিত হয়। নিত্য নতুন ভোগ্য পণ্য সর্বদা আমাদের হাতছানি দেয়, আমরা ঐ ভোগ্য পণ্য পেতেও চাই। পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের (টাকা-পয়সা) মাধ্যমে আমরা ঐ ভোগ্য পণ্যগুলি করায়ত্ব করি। অর্থ হল ঐ ভোগ্য বস্তুগুলি পাওয়ার উপায়, তাই অর্থের প্রতি আমাদের এত আকাঙ্খা। কিন্তু অর্থ ও ভোগ্য বস্তু এক জিনিস নয়। অথচ দুটিই আমাদের চাই। অর্থ হল ভোগ্য পণ্য পাওয়ার উপায় আর ভোগ্য পণ্য হল উপেয়। আনন্দবর্ধন এই প্রসঙ্গে একটি দীপশিখার উদাহরণ দিয়েছেন,

"আলোকার্থী যথা দীপ-শিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ।।"[২]

অন্ধকার ঘরে কোন বস্তুকে দেখার জন্য আলোর প্রয়োজন। আলো ছাড়া অন্ধকারে কোন বস্তু দেখতে পাওয়া অসম্ভব। মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে দেখতে পাওয়ার তাগিদে আলোক বা দীপশিখার প্রতি যত্নবান হয়। একই রকম ভাবে কাব্যে কবিগণ প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ অর্থের প্রতি লক্ষ স্থির করে ঐ লক্ষ বা অর্থ পাওয়ার উপায় হিসেবে বাচ্য অর্থের প্রতি যত্ন নেন।

বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম উদ্যোতের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে বলেছেন,

"...পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।
বাচ্যার্থ-পূর্বিকা তদ্বৎ প্রতিপৎ তস্য বস্তুনঃ"।।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যথা হি পদার্থদ্বারেণ বাক্যাথার্বগমস্তথা বাচ্যার্থ-প্রতীতি-পূর্বিকা ব্যাঙ্গ্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ"। অর্থাৎ বাক্যার্থ বোধের ক্ষেত্রে যেমন আগে পদের অর্থের বোধ হয় তেমনি ব্যঙ্গার্থ প্রতীতির জন্য আগে বাচ্যার্থের প্রতীতি হয়। পদের অর্থ না জেনে যেমন বাক্যার্থের অর্থবোধ হয়না তেমনি বাচ্যার্থের বোধ না হলে ব্যঙ্গার্থের বোধ হয় না। যেমন 'আমি বাড়ি যাই' এই বাক্যের অন্তর্গত 'আমি', 'বাড়ি' এবং 'যাই' এই তিনটি পদ ও তাদের ক্রমবিন্যাসের বোধ উক্ত বাক্যার্থ বোধের আবশ্যিক শর্ত তেমনি বাচ্যার্থের ও ব্যঙ্গার্থের ক্ষেত্রটিও ক্রমিক। এখন যে প্রশ্নটি ওঠে সেটি হল তাহলে পদার্থ ও বাক্যার্থ বোধের সম্বন্ধ, আর বাচ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থের সম্বন্ধটি কি একই রকম? আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যোতের ৮৭ সংখ্যক ন্যায় নয়। পদার্থ-বাক্যার্থের সম্বন্ধ ঘট ও তার উপাদানের (মাটি প্রভৃতি) সম্বন্ধের অনুরূপ কিন্তু বাচ্য-ব্যঙ্গ অর্থের সম্বন্ধ ঘট-প্রদীপের সম্বন্ধের সঙ্গে তুলনীয় ("যথা হি ঘটে নিষ্পন্নে তদুপাদানকারণানাং... ঘটপ্রদীপন্যায়স্তয়োঃ।।")[৩]

মৃত্তিকা হল ঘটের উপাদান। এই উপাদানটির পৃথক অস্তিত্ব ততক্ষণই স্বীকৃত হয় যতক্ষণ ঘটটি নির্মিত ঘট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে না, বা ঘট নামে চিহ্নিত হয় না। সম্পূর্ণভাবে ঘট নির্মিত হলে পৃথক উপাদানের আর উপলব্ধি হয় না, তখন কেবলমাত্র নির্মিত ঘটেরই উপলব্ধি হয়। একই রকম ভাবে বাক্যের অর্থ প্রকাশের জন্য তার উপাদান স্বরূপ পদসমূহের অর্থবোধের প্রথমে প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাচ্যার্থ বোধ হলে পদার্থ সমূহের আর পৃথক ভাবে বোধ হয় না। বাক্যার্থ বোধের পর যদি পৃথক ভাবে পদার্থের বোধ হত তাহলে বাক্যার্থ বোধই সম্ভব হত না, তা পদার্থবোধ হিসাবে চিহ্নিত হত। অর্থাৎ বাক্যার্থ বোধ হতে গেলে পদার্থবোধ লুপ্ত হয়।

অন্যদিকে বাচ্য-ব্যঙ্গার্থের সম্বন্ধ উক্ত ঘট ও তার উপাদানের সম্বন্ধের মতো নয় তা ঘট ও প্রদীপের সম্বন্ধের ন্যায়। কারণ ব্যঙ্গার্থ বোধ যদিও বাচ্যার্থ বোধের উপর নির্ভর করেই উৎপন্ন তথাপি ব্যঙ্গার্থ বোধ লুপ্ত হয় না। আনন্দবর্ধনের মতে ব্যঙ্গার্থ ও বাচ্যার্থের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ রয়েছে।[৪] একটি ব্যতীত অন্যটি থাকতে পারে না। উভয় ব্যাপারই যুগপৎ ঘটে থাকে।

ব্যাঙ্গার্থ ও বাচ্যার্থের সম্বন্ধ ঘট-প্রদীপ সম্বন্ধের অনুরূপ। এই অনুরূপতা প্রকাশ করা যায় এভাবে-কোন অন্ধকার ঘরে কোন একটি ঘটকে দেখার জন্য আমরা প্রদীপের সাহায্য নিই। প্রদীপের আলো আমাদের অন্ধকার স্থানে থাকা ঘটটিকে দেখতে সাহায্য করে। এখানে প্রদীপ ঘটপ্রকাশক। ঘট ও প্রদীপ দুইয়েরই অস্তিত্ব থাকে। উভয়েই যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। কোনটিই নষ্ট হয় না। সেইরূপ বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গার্থের প্রকাশ হলেও ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থের বিনাশক হয় না, বা বাচ্যার্থ ব্যঙ্গার্থের দ্বারা বিনাশ্য হয় না।[৫]

এখন প্রশ্ন হল কোন একটি বিশেষ বাক্যের একটি বাচ্য অর্থ ও আর একটি ব্যঙ্গ অর্থ- এইভাবে যদি দুটি ভিন্ন অর্থ স্বীকার করা হয় তাহলে বাক্যের 'একার্থবোধকতা' নামক লক্ষণটি আর বাক্যটির ক্ষেত্রে খাটে না। সেক্ষেত্রে ঐ বাক্যের বাক্যতেই নষ্ট হয়ে যায় না কী? আনন্দবর্ধনের মতে একটি বাক্যের একটি বাচ্য অর্থ ও একটি ব্যঙ্গ অর্থ বা প্রতীয়মান অর্থ স্বীকারের ফলে এরূপ কোন কোন দোষ হয় না।[৬] কেননা অর্থ মুখ্য ও গৌণ এই দুই ভাবে ঐ বাক্যে থাকে। কোথাও ব্যঙ্গার্থ মুখ্য বা প্রধান বাচ্যার্থ গৌণ বা অপ্রধান, আবার কোথাও বাচ্যার্থ মুখ্য বা প্রধান, ব্যঙ্গার্থ গৌণ বা অপ্রধান। গৌণ ও মুখ্যভাবে বাচ্যার্ত্যহ ও ব্যঙ্গার্থের যে অবস্থিতি তার মধ্যে যখন ব্যঙ্গার্থ মুখ্য বা প্রধান তখন সেই ব্যঙ্গার্থই ধ্বনি। কাব্যে ব্যঙ্গার্থই মুখ্য বা প্রধান, কাব্যে এই ব্যাঙ্গার্থই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একই বাক্যে বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ যুগপত অবস্থান করতে পারে এই অভিপ্রায়েই আনন্দবর্ধন বলেছেন একই বাক্যে দুটিরই একত্র বিদ্যামান্যতা সম্ভব। "গুণপ্রাধানভাবেন তয়োর্ববস্থানাৎ"- এই বাক্যটির মাধ্যমে আনন্দবর্ধন বলতে চেয়েছেন একই বাক্যে দুটির একত্র বিদ্যমানতা সম্ভব। একটি থাকে মুখ্যভাবে অন্যটি থাকে গৌণ ভাবে। যেখানে ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য সেখানে বাচ্যার্থটি গুণীভূত। তাই বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে কখনো গৌণ ভাবে কখনো মুখ্য ভাবে ব্যঙ্গার্থকে স্বীকার করতেই হয়। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের এই দুরকম অবস্থিতি প্রমাণ করে যে ব্যঙ্গার্থ ও বাচ্যার্থ পৃথক এবং ব্যঙ্গার্থ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র ভাবেই অবস্থান করে।[৭]

এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনকৃত বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের আর একটি বিশেষ প্রভেদ উল্লেখ করা যেতে পারে। আনন্দবর্ধনের মতে বাচ্যার্থ শুধুমাত্র শব্দকে আশ্রয় করে থাকে কিন্তু ব্যঙ্গার্থ শব্দ ও অর্থকে উভয়কে আশ্রয় করে থাকে কিন্তু ব্যঙ্গার্থ শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয় করে থাকে। বাচকত্ব কেবল শব্দাশ্রয়ী, কিন্তু ব্যঞ্জকত্ব উভয়াশ্রয়ী। শব্দ ও অর্থ উভয়েরই ব্যঞ্জকত্ব আছে।[৮]

কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের দ্বারা শব্দ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দের দ্বারা অর্থ গুণীভূত হয়ে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে অর্থের দ্বারা শব্দ গুণীভূত হয়ে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে ব্যঙ্গার্থকে বলা হয় বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে অর্থাৎ যেক্ষেত্রে শব্দের দ্বারা অর্থ গুণীভূত হয়ে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে ব্যঙ্গার্থকে বলা হয় অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি। আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম উদ্যোতের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি ধ্বনির বিভাগ নির্দেশ করেছেন।[৯]

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি: বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীকৃত হয় যার দ্বারা তাই হল অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি। অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হয় না, এক্ষেত্রে শব্দই প্রধানভাবে ব্যঞ্জক হয়। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণ হিসেবে আনন্দবর্ধন বলেছেন তিন শ্রেণীর লোক পৃথিবীর স্বর্ণপুষ্প চয়ন করতে পারবেন, এই তিন শ্রেণী হল শূর, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তি।[১০] পৃথিবী কিন্তু পুষ্পবৃক্ষ নয়, যার থেকে কোন ফুল তোলা সম্ভব, অতএব মুখ্য অর্থে এই শ্লোকের অর্থবোধে বাধা ঘটে। শূর, কৃতবিদ্য বা সেবাপরায়ণ ব্যক্তি এই তিন শ্রেণির ব্যক্তির কোন ব্যক্তির পক্ষে ফুল তোলার ব্যাপারটি অসম্ভব, বাচ্যার্থের এখানে বিবক্ষা নেই, শব্দই এখানে প্রধান ও বাচ্যার্থ হল তার সহকারি।

আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্যোতের শুরুতেই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির দুটি বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই দুটি বিভাগ হল (১) অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি, এবং (২) অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি।[১১] যখন কোন অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হয় তখন তা অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যধ্বনি। এখানে বাচ্যার্থ লক্ষিত অর্থের অনুগত। বাচ্যার্থ এক্ষেত্রে অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়। অপর দিকে অত্যন্ততিরস্কৃত অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি হল বিশেষ ভাবে তিরস্কৃত বা আচ্ছন্ন বাচ্যধ্বনি। যখন কোন বাচ্য অর্থের উপপত্তিই না হয় এবং তা অর্থান্তর গ্রহণের উপায়মাত্র হয়েই শেষ হয়ে যায়, তখন সেই বাচ্য অর্থ হল অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি।[১২]

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি: বিবক্ষিত অন্য পরবাচ্য, অর্থাৎ যার দ্বারা বিবক্ষিত বা প্রধানীভুত হয় তাই বিবক্ষিত পরবাচ্যধ্বনি। এক্ষেত্রে অর্থই প্রধান ভাবে ব্যঞ্জক। আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে "হে তরুণী, সেই শুকশাবক কোথায় কোন্ পর্বতে কতদিন ধরে কি জাতীয় তপস্যা করেছে যার ফলে সে তোমার অধরের মতো পাটলবর্ণ বিম্বফলকে

আস্বাদন করছে"।[১৩] এখানে তরুণীর উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন তা আসলে তরুণীকে লাভ করার অভিলাষ থেকে উত্থিত। নায়ক তার বাগবৈদগ্ধে চাটুবাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে নাত্যিকার মনে অভিলাষ উদ্দীপ্ত করছে। এটিই এখানে প্রধান ব্যঙ্গ। নায়কের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ জ্ঞাপনই এক্ষেত্রে প্রধান ব্যঞ্জক। কি কি তপস্যা করলে অন্য কথায় কি কি শর্তপালন করলে নায়ক নায়িকার কাছাকাছি আসতে পারবে – এই বিষয়টি জানাই প্রধান।

বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি দুই প্রকারের, একটি হচ্ছে অসংলখ্যক্রমোদ্দোত অর্থাৎ যেখানে ক্রমের প্রকাশ সম্যকরূপে লক্ষ্য করা যায় না (অসংলক্ষ্যক্রম)। আর অপরটি হল সংলক্ষ্যক্রমোদ্দোত বা ক্রমানুসারে প্রকাশিত (সংলক্ষ্যক্রম)। রস, ভাব, রসের আভাস, ভাবের আভাস প্রভৃতি অসংলক্ষ্যক্রম ও বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম।[১৪]

আচার্য মম্মট প্রমুখ আলংকারিকগণ ব্যঞ্জনাকে স্বতন্ত্র বৃত্তিরূপে মেনেছেন। মম্মট প্রমুখ আলংকারিক আচার্যগণ ব্যঞ্জনাকে দুভাগে ভাগ করেছেন এক শাব্দীব্যঞ্জনা এবং দুই আর্থীব্যঞ্জনা।[১৫] যে স্থলে শব্দকে আশ্রয় করে ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন হয় সে স্থলে শাব্দীব্যঞ্জনা ও যে স্থলে অর্থকে আশ্রয় করে ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন হয় সে স্থলে আর্থীব্যঞ্জনা হয়।[১৬] 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'- এখানে 'গঙ্গা' শব্দ অভিধাবৃত্তি দ্বারা জলপ্রবাহকে বোঝায়, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গাতীর রূপ অর্থকে বোঝায়, এবং ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা শৈত্যশুচিতাধিক্য রূপ অর্থকে বোঝায়। এটি হল শাব্দীব্যঞ্জনার উদাহরণ।[১৭] অপর দিকে আর্থীব্যঞ্জনার উদাহরণে বলা হয়েছে;

"গচ্ছ গচ্ছসি চেত কান্ত পন্থানঃ সন্তু তে শিবাঃ।
মমাপি জন্ম তত্রৈব ভূয়াদ্ যত্র গতো ভবান্।।"

"হে কান্ত, তুমি বিদেশে যাচ্ছ যাও। তোমার পথ মঙ্গলময় হোক্, তুমি যে দেশে যাচ্ছ সে দেশেই আমার জন্ম হোক্"- পতির উদ্দেশ্যে পত্নীর দ্বারা উচ্চারিত বাক্যগুলিতে কোথাও পতির বিদেশ যাওয়া নিষেধ সূচিত না হলেও, পতির একথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে তার যাত্রা পত্নীর কাছে অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। পত্নীর এরূপ বাক্য পতির যাত্রা নিষেধ সূচক। এটি হল আর্থীব্যঞ্জনার উদাহরণ।[১৮]

আচার্য মম্মট শাব্দীব্যঞ্জনা কে অভিধামূলা ও লক্ষণামূলা এই দুইভাবে ভাগ করেছেন। যে স্থলে বাচ্যার্থ জ্ঞানের পরেই ব্যঞ্জনার জ্ঞান হয় তা অভিধামূলা ব্যঞ্জনা। ও যে স্থলে লক্ষার্থজ্ঞানের পরে ব্যঙ্গার্থের জ্ঞান হয় তা লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনা।[১৯]

যাই হোক এ প্রসঙ্গে যে কথাটি বলা দরকার তা হল শাব্দীব্যঞ্জনা আনন্দবর্ধন কৃত অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি ও আর্থীব্যঞ্জনা বিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হয়। কেননা অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির ক্ষেত্রে শব্দের দ্বারা অর্থ গুণীভূত হয়ে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশ করে আর বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির ক্ষেত্রে অর্থের দ্বারা শব্দ গুণীভূত হয়ে ব্যঙ্গার্থ প্রকাশ করে। যেখানে শব্দ ব্যঞ্জক সেখানে অর্থ সহকারি। আর যেখানে অর্থ ব্যঞ্জক সেখানে শব্দ সহকারি। সহকারি ভেদে বুঝতে হবে কোথায় শাব্দীব্যঞ্জনা আর কোথায় আর্থীব্যঞ্জনা হবে।

তথ্যসূত্র:

১। "... বস্তুমাত্রমলংকারারসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নদর্শয়িষ্যতে।" ধ্বন্যালোক আনন্দবর্ধন ১ম উদ্যোত কারিকা ১৩, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৩৬।
২। ঐ, কারিকা ২৫, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৭২।
৩। ধ্বন্যালোক আনন্দবর্ধন ৩য় উদ্দ্যোত কারিকা ৮৭, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৩-২৮৪।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৬। ঐ, কারিকা ৮৮, পৃষ্ঠা-২৮৬।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৬।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৭।
৯। ঐ, ১ম উদ্যোত, কারিকা ৪২, পৃষ্ঠা-১২৬।

১০। "সুবর্ণ পুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বতি পুরুষাস্তয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম।।" ।।ঐ।

১১। "অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্।
অবিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধা মতম্।।"।।ঐ, ২য় উদ্যোত কারিকা ১, পৃষ্ঠা-১।

১২। "যদি কোন অর্থ বাচ্যভাবে উৎপন্ন হয়, অথচ সেই অর্থ সমগ্র বাক্যের উপযোগী হয় না এবং তার ফলে উপযোগী অর্থের প্রয়োজনে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয় ও সেকারণে লক্ষণা শক্তির দ্বারা অন্য অর্থ লক্ষিত করে, তাহলে সেই বাচ্যার্থকে অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি বলে।" ঐ, ২য় উদ্যোত পৃষ্ঠা-৩-৬।

১৩। ঐ, কারিকা ৪২, ১ম উদ্যোত, পৃষ্ঠা-১২৭।

১৪। ঐ, কারিকা ৬, ২য় উদ্যোত, পৃষ্ঠা-১১।

১৫। শব্দার্থতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-১৬৬।

১৬। ঐ।

১৭। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা গঙ্গাধর কর, পৃষ্ঠা-৩০৮।

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৮-০৯।

১৯। শব্দার্থতত্ত্ব, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা-১৬৭।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২। গোস্বামী, বিজয়া: "রূপক অলংকারে শব্দার্থবিচার", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স।

৩। মিশ্র প্রভাত: "তাৎপর্যের কথা", শব্দার্থ বিচার, রঘুনাথ ঘোষ ও ভাস্বতী চক্রবর্তী ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, এলাইড পাবলিশার্স।

৪। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।

৫। ধ্বন্যালোক, আনন্দবর্ধন, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৯।

৬। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৮।

৭। ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র কুমার, শব্দার্থতত্ত্ব, সদেশ, ২০০৯।

৮। সাহিত্যদর্পণ, আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২য় সংস্করণ ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৯। Dhvanyāloka, Ānandavardhana(Uddyota I): Edited by Bishnupada Bhattacharya, Firma KLM Private Limited, Calcutta.